প্রতিধ্বনি the Echo
A Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বৃত্তিভিত্তিক মধ্যবিত্ত আইনজীবী শ্রেণির নানা জীবিকার আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন

প্রশান্ত দাস
গবেষক, বাংলাবিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract

The artistic and sociological significance of Tagore's short stories can be well penetrated from various angles. His short stories not only portrays the life style of the middle class people but also documented their professions. In Tagore's short stories, three distinctive middle class people have been identified, namely middle class related to service sector and intellectual middle class. The present research paper focuses on the middle class belonging to the law related service sector. The British colonial policy is highly influential in generating interest among middle class towards law related service sector. Among the middle class professionals in several service sectors in the 19th and 20th century, the law related professional were the dominate group. The socio-economic condition of this profession and the people related to it will be studied in this paper with reference to the short stories of Tagore. The present paper also focuses on the evolutionary history of the law related professionals in Bengal.

সমাজের উঁচুতলার বাসিন্দা হয়েও রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের দেখেছেন আন্তরিকভাবে। একসময় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি অনৈতিক কথা প্রচলিত ছিল যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাঙালি জীবনের সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত ছিলেন না । কিন্তু তাঁর ছোটগল্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমাদের এই ভ্রান্তির অবসান ঘটে। আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, যদি তিনি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাঙালি সমাজের জীবনধারা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হতেন তবে তাঁর সাহিত্যে কখনো তাদের প্রতিফলন ঘটতো না।

সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই আমাদের সমাজে বর্গ বিভাজন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই বিভাজন রেখার অন্যতম নির্দেশক হলো বিত্ত । এই বিত্তের প্রতি আকর্ষণই মানুষকে এগিয়ে দিয়েছে। মানুষ যখন অরণ্য জীবন ত্যাগ করে প্রথম দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে শুরু করলো অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ হতে আরম্ভ করলো তখন বিভিন্ন গোষ্ঠীর একজন গোষ্ঠীপতি থাকতো। স্বাভাবিক ভাবেই গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্য থেকে গোষ্ঠীপতি অধিক ক্ষমতা ভোগ করতো। ফলে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায় সামাজিক স্তরান্তরের ধারণা, যা অনেকাংশেই বিত্তকেন্দ্রিক।

Jhon scoot এবং Gordon marshall সম্পাদিত Oxford Dictionary of Sociology অনুসারে 'middle class' এর অর্থ 'In many ways this is the lest satisfactory term which attempts in one phrase to define a class sharing common work and market

situations.' আর Lair Mcleast সম্পাদিত Oxford Concise Dictionary of Politics অনুসারে 'middle class' হলো – 'The class or social Stratum lying above the working class and below the upper class. It is term that everybody even difines.' এই শব্দবন্ধের প্রথম প্রয়োগ ঘটে ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে। ডেনমার্কের রাণী ক্যারোলীন সর্বপ্রথম 'middle class' এই শব্দটি ব্যবহার করেন।

মধ্যশ্রেণিই সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলে প্রচারিত হয়ে থাকে। যদিও এটি ইংরেজি 'মিডল ক্লাস' শব্দের যথার্থ আভিধা নয়। কিন্তু উচ্চশ্রেণিকে বিত্তবাণ, মধ্যশ্রেণিকে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন শ্রেণিকে বিত্তহীন - এই দৃষ্টিকোণে যদি দেখা হয় তবে তা যথার্থ বলেই মনে হয়। কারণ পূর্বেই উল্লেখিত যে বর্তমানে শ্রেণি বিচারের প্রধান বা উল্লেখযোগ্য মানদণ্ড হলো বিত্ত।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি কিছু পরিমানে বিত্তবান,একেবারে নিঃস্ব বা দরিদ্র নয়। মার্ক্সীয় ধারণায় – পুঁজিবাদের অবাধ স্বাধীন বিকাশের ফলে সমাজের শ্রেণিবিভাগ অনেক বেশি পরিমাণে স্পষ্ট আর নগ্ন হয়ে ওঠে। যে সমাজ যত বেশি Stratified (বিভক্ত), সে সমাজে মধ্যবিত্তের স্থান নির্ণয় তত কঠিন। বর্তমানে ভারতবর্ষের সমাজকে অতি উচ্চবিত্ত, উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বা অতি দরিদ্র শ্রেণি ইত্যাদি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই বিভাজন যদিও arbitrary (বিতর্কিত)। নিম্নবিত্ত দরিদ্র শ্রেণি ও অতি দরিদ্রশ্রেণিকে বাদ দিলে উল্লেখিত বিভাজন রেখা মোটেই স্পষ্ট নয়। সেইজন্য মাছিমারা কেরানি থেকে অফিসের বড়বাবু, উকিলের মুহুরি থেকে বিচারকমশাই, ওয়ার্ডমাস্টার থেকে বড় ডাক্তার এরা সকলেই মধ্যবিত্ত।

বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের উত্থানের যুগ হিসাবে ইংরেজ আগমণের পরবর্তী কালকেই চিহ্নিত করা যায়। যদিও ইংরেজ আসার আগেও এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। মোগল রাজশক্তি পতনের পর নগর কেন্দ্রগুলিতে এসে তারা ভিড় করেছিল। এরা আসলে ছিল ভারতের ব্যাবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণি। নবাব-বাদশা, রাজা-মহারাজাদের ভোগবিলাসের বিবিধ সামগ্রী সর্বরাহ করে এরা বিপুল ধনঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিল।

বাংলাদেশ ইংরেজদের দখলে আসার পর সমাজের সবকিছুই ভাঙনের মুখে পড়ে। যদিও ইংরেজদের ক্ষমতাদখলের কাল থেকে আধুনিক যুগের সূচনা বলে ধরা হয়। তবে পুনর্গঠন যা কিছু হয়, তা ইংরেজদের আপন স্বার্থসিদ্ধির কারণে। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন কোলকাতার অদূরে পলাশীর এক আম্রকুঞ্জে বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। এরপর ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা-বিহারে দেওয়ানী প্রথা চালু হয়ে ইংরেজরাই রাজদণ্ডের অধিকারী হয়ে ওঠে। ১৭৯৩ সালে ভূমি রাজস্য আদায়ের জন্য প্রবর্তিত হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ হওয়ার পর জমির মালিকানাস্বত্বই হয়ে ওঠে ধনঐশ্বর্যের পরিচায়ক। আসলে পলাশীর যুদ্ধের পর মৎসন্যায়ের কারণে সমাজে ভাসমান নগদ অর্থ ধূর্ত, ক্রুড়, নিষ্টুর ব্যক্তিদের হাতে জমা হতে থাকে। বিনিয়োগের অন্যকোনো রাস্তা না থাকায়, এই শ্রেণির ব্যক্তিরা জমিদারি ক্রয়ের দিকে ঝুকে পড়ে। জমিদারির প্রতি আকর্ষণের ফলে উদ্ভূত নব্য জমিদার শ্রেণি ইংরেজদের অনুগত প্রাণী হিসেবেই পরিচালিত হতে থাকে। জমিদারি বিষয়ে অনাভিজ্ঞ এই শ্রেণি স্বাভাবিক ভাবেই খাজনা আদায়ের জন্য মধ্যস্বত্বভোগী ও খাজনা আদায়কারী একদল এজেন্টের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এদেরকেই বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির পূর্বপুরুষ বলা চলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের প্রায় এক শত বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে এই মধ্যস্বত্বভোগীদের মূল শিকড় বর্ধিত কলেবরে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিল।

মধ্যবিত্তের উদ্ভবের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় না এগিয়ে বর্তমান নিবন্ধে আমরা শুধুমাত্র রবীন্দ্র ছোটগল্পে বৃত্তিভিত্তিক মধ্যবিত্ত আইনজীবী শ্রেণির নানা জীবিকার আর্থ-সামাজিক মূল্যায়নের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবো। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সাধারণত তিন ধরণের মধ্যবিত্ত শ্রেণির সন্ধান পাওয়া যায়। যথা- ক) ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত মধ্যবিও শ্রেণি, খ) বৃত্তিভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি, গ) মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি।

বৃত্তিভিত্তিক মধ্যবিত্ত আইনজীবী শ্রেণির যে সকল জীবিকার সন্ধান রবীন্দ্র ছোটগল্পে পাওয়া যায় তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল –

১। উকিল
২। ব্যারিস্টার

৩। ম্যাজিস্ট্রেট
৪। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
৫। জজ
৬। হাকিম
৭। কালেক্টর
৮। মুন্সেফ
৯। মোক্তার

উল্লেখিত তালিকা করণের পর বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে উক্ত জীবিকার অধিকারী নানা চরিত্রের একটি সারণি উপস্থাপন করা হল –

ক) গল্পে উকিল চরিত্র:-

ক্রমিক নম্বর	চরিত্রের নাম	গল্পের নাম
১.	অপূর্ব রায় (আইনের ছাত্র)	সমাপ্তি
২.	অম্বিকাচরণ	রবিবার
৩.	উকিল (জনৈক উকিল)	মুক্তির উপায়
৪.	উকিল (জনৈক উকিল)	যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ
৫.	জগদীশ প্রসাদ	শেষ পুরস্কার
৬.	নীলরতন	রাজটিকা
৭.	পরেশ	উদ্ধার
৮.	বংশীলাল (আইনের ছাত্র)	হালদারগোষ্ঠী
৯.	বসন্তবাবু	উলুখড়ের বিপদ
১০.	বাবা (বক্তার বাবা)	নামঞ্জুর গল্প
১১.	মুকুন্দ	চিত্রকর
১২.	রঘুনাথ বাবু	নষ্টনীড়
১৩.	রামতারণ	সমস্যাপূরণ
১৪.	রামলোচন রায়	একরাত্রি
১৫.	শশিভূষণ	মেঘ ও রৌদ্র

খ) গল্পে ব্যারিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট,ডেপুটি ম্যাজিস্টেট, জজ, হাকিম, কালেক্টর, মুন্সেফ, মোক্তার, চরিত্র

ক্রমিক নম্বর	চরিত্রের নাম	গল্পের নাম
১।	অনুকূলবাবু (মুন্সেফ)	খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন
২।	জজ (জনৈক অ্যাডিশনাল জজ)	উলুখড়ের বিপদ
৩।	তারিণীবাবু (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট)	দিদি
৪।	দাদা (কুমুর দাদা) (ব্যারিস্টার)	দৃষ্টিদান
৫।	নীলরতন (কালেক্টর)	একরাত্রি
৬।	বাবা (সনৎকুমারের) (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট)	পাত্র ও পাত্রী
৭।	মিস্টার ভাদুরি (ব্যারিস্টার)	কর্মফল
৮।	মোহিতমোহন দত্ত (জজ)	বিচারক
৯।	রামসদয় (মোক্তার)	সে- ৮ অধ্যায়ের অজগবি গল্প
১০।	সাহেব (জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট)	মেঘ ও রৌদ্র
১১।	সাহেব (ম্যাজিস্ট্রেট)	মেঘ ও রৌদ্র

১২।	সাহেব (ম্যাজিস্ট্রেট)	দিদি

উল্লেখিত তালিকাকরণের পর বর্তমানে বৃত্তিভিত্তিক মধ্যবিত্ত আইনজীবী শ্রেণির নানা জীবিকার আর্থ-সামাজিক মূল্যায়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। আসলে বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় পেশাদার বা বৃত্তিভিত্তিক সামাজিক শ্রেণি তথা মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ খুব সহজ ও সাবলীল ছিল না। বাংলাদেশে পেশাদার মধ্যবিত্তের উত্থানের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল প্রথাগত ধর্ম ও জাতিভিত্তিক সমাজ। এদেশের ব্রাহ্মণ ও মৌলভীরা বহুকাল ধরে শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন ভারতে প্রথাগত পেশার বিকাশের পথকে প্রশস্ত করে । শিক্ষা, চিকিৎসা ও আইন – পেশাদারি বৃত্তির প্রধান তিন স্তম্ভ ধর্ম ও রক্ষণশীল সমাজিক বেষ্টনী থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর কর্মকাণ্ড ও সামাজিক পরিবর্তনের সুযোগ পায়। যে কোনো বর্ণ ও ধর্মের মানুষ যেমন যে কোনো পেশা গ্রহণ করতে পারল, তেমনি বর্ণগত পেশার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পেশাগত গতিশীলতা অনেকগুণ বেড়ে গেল। তাছাড়া ঔপনিবেশিক বাংলাদেশে তথা ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনে পেশাগত গতিশীলতা দিন দিন আরো বৃদ্ধি পায়।

উনিশ ও বিশ শতকে বাংলাদেশে গড়ে ওঠা পেশাদারি মধ্যবিত্তের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশীল ও শক্তিশালী ছিল আইনজীবীরা । লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে সপ্তম আইনে আধুনিক আইন ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সরকারি উকিল নিয়োগ এবং বিচারবিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করে ব্রিটিশ সরকার এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্টা করে। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে গঠিত চার্টার অ্যাক্টে এদেশের আইন সচিবের নিযুক্তি, বিভিন্ন ধরনের বিচারালয় গঠন এবং এদেশের আইনগুলি নথিবদ্ধ করার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গঠিত হলো আইন কমিশন। '১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে সদর দেওয়ানি, সদর নিজামত ও সুপ্রিম কোর্টকে একত্রিত করে গড়ে উঠল কলকাতা হাইকোর্ট। মফঃস্বলের সব আদালতকে এর আওতায় আনা হল। কলকাতা হাইকোর্টে মৌলিক ও আপীল মামলা বিচারের ব্যবস্থা হয়। এসব কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়াও বাংলাদেশে আইন ব্যাবসায়ের অসাধারণ অগ্রগতির কারণ হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মুক্ত অর্থনীতি।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির বাণিজ্যাধিকারের অবসান ঘোষিত হয়। ইউরোপীয়দের এদেশে বসবাস, জমি কেনা ও বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয়। এর পর থেকে গড়ে উঠল নতুন আর্থিক কর্মকাণ্ড ও নানা ধরনের শিল্প-বাণিজ্য সংস্থা। এসবের আইনগত সমস্যা মেটানোর জন্য প্রচুর আইনজীবীর চাহিদা সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময় লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন ও শিক্ষাকে স্বতন্ত্র শাখারূপে মর্যাদা দান করেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলে জে আইন বিভাগ স্থায়িত্ব লাভ করে। আইন ব্যাবসায়ীর নির্দিষ্ট যোগ্যতা নিরুপণ করে সরকারি আদেশ জারি করা হয়। '১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে আইন ব্যাবসা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়।' (বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫০) পূর্বে আইন ব্যবসায়ী প্রাপ্য মজুরি নির্দিষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে সরকারী তালিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট মজুরির পরিবর্তে আইনজ্ঞ ও মক্কেলের চুক্তির মাধ্যমে আইন ব্যবসায়ীর প্রাপ্য মজুরি স্থির হওয়ার প্রথা আরম্ভ হয়। যা পূর্বে ছিল স্থির নির্দিষ্ট। সরকারি তালিকা অনুযায়ী আইন ব্যবসায়ীর নির্দিষ্ট মজুরির প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়। '১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের আগে ফৌজদারী মামলায় আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল না। ঐ বছর ফৌজদারী মামলার আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিল নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়। হাউস অব কমন্সে প্রদত্ত হোল্ট ম্যাকেনজির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে উনিশ শতকের প্রথম থেকে বাংলাদেশে আইন ব্যাবসা বেশ সুগঠিত পেশার রূপ নিয়েছিল । বিশেষ করে কলকাতায় এই পেশা ছিল অঢেল সম্পদ ও সম্মানের উৎস।' (বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫০) ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এই পেশার প্রতি সকলের ঝোঁক লক্ষ করা গেল। ক্রমে আইন ব্যাবসায়ের বিস্তৃত পরিমণ্ডল তৈরি হওয়ায় আইন গ্রাজুয়েটদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে লাগল।

তৎকালীন সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি দু'জন গ্রাজুয়েটের একজন ছিল আইন গ্রাজুয়েট। '১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে স্ট্যাটিস্টিক্যাল এ্যবস্ট্রাক্ট (Statistical Abstract) থেকে জানা যায় ঐ বছর বাঙলায় দেওয়ানি মামলার সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ।' (বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫০) এর কারণ হিসেবে অবশ্যই জমিদারি ব্যবস্থায় ভূমির মালিকানার অনিশ্চিয়তা দায়ি। ফলে বাংলাদেশে তৈরি হল ভারতের মধ্যে বৃহত্তর আইন ব্যবসায়ীর দল। ক্রমে কলকাতা ছাড়িয়ে তা বিস্তার লাভ করলো সমগ্র বাংলাদেশে। '১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা ডিভিসনে ছিল ৩ জন ব্যারিস্টার, ৩৭২ জন উকিল ও ৪৭০ জন ল'এজেন্ট। বাখরগঞ্জ জেলায় ছিল ৭১ জন উকিল, ২৬১ জন ল'এজেন্ট, বর্ধমান জেলায় উকিলের সংখ্যা ২১০, ল'এজেন্ট ২১৪ জন, মেদিনীপুরে এদের সংখ্যা যথাক্রমে ৯৬ ও ৩৮৮। কলকাতার শহরতলী হুগলী ও হাওড়াতে প্রচুর উকিল পাওয়া যেত; নদীয়া জেলায় এই সময়ের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটি সক্রিয় উকিল সংঘ (বার)। কলকাতা ৩২৪ পরগণায় আইন ব্যবসায়ী সংখ্যা সবচেয়ে বেশি - ২৬ জন ব্যারিস্টার, ১২৭ জন এটর্ণি, ৫৩১ জন উকিল ও ৭৮৪ জন ল'এজেন্ট।' (বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫১) নিম্নে ১৮৭০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের উকিল ও এডভোকেটের সংখ্যার একটি সারণি উপস্থাপন করা হল -

কলকাতা হাইকোর্টের উকিল

বৎসর	এ্যাডভোকেটের সংখ্যা	উকিলের সংখ্যা
১৮৭০ পর্যন্ত	১৯	৩১
১৮৭১-১৮৮০	৬৪	৩০
১৮৮১-১৮৯০	৬০	৪৫
১৮৯১-১৯০০	১২৬	৮৫
মোট	**২৬৯**	**১৯২**

(উক্ত ছকটি 'বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক', সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫১ থেকে গৃহীত)

বিশ শতকের প্রারম্ভ লগ্ন থেকেই আইন ব্যবসায়ীদের ক্রমবর্ধমান গতিতে কিছুটা মন্থরতা লক্ষ করা যায়। কারণ বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে বাংলার দেওয়ানি মামলার পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। '১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ানি মামলার সংখ্যা ছিল ২.৭ মিলিয়ন, ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে এ সংখ্যা কমে দাড়াল ১.৮ মিলিয়নে। (বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫১) তাছাড়া দিন দিন আইন গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আইন ব্যাবসায়ে আয় দিন দিন কমতে থাকে। তবে একথা স্বীকার্য যে, আইনজীবীরা স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। ফলে স্বাধীন মানসিকতা নিয়ে চলার কারণে নানা রক্ষণশীলতার গণ্ডীকে অতিক্রম করে বহুক্ষেত্রেই তারা প্রগতিশীলতার ঝান্ডাকে বহন করেছেন সাহসিকতার সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে আমরা আইন ব্যাবসায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জীবিকার অধিকারী যে সকল চরিত্রের সাক্ষাত পাই সূচনাসূত্রে তার একটি তালিকা উপস্থাপিত করা হয়েছে। তাঁর গল্পে যে সকল উকিল, ব্যারিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, হাকিম প্রভৃতি আইনজীবী নানা চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তারা প্রত্যেকেই আখ্যানে সমভাবে গুরুত্ব পায়নি। কোনো কোনো চরিত্র অনেক সময় আখ্যানের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করেছে, আবার কারো উল্লেখই সার, আখ্যানে তাদের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নানা শ্রেণির জীবিকার অধিকারী যে সকল চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে আইন ব্যাবসার সাথে সম্পর্কযুক্ত চরিত্রের সংখ্যাই সর্বাধিক।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজটিকা' গল্পের নবেন্দুশেখরের শ্যালীপতি নীলরতন বক্সারের

একজন উকিল। সাহেবদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা একটু অন্যরকম। সাহেবদের সঙ্গে বিশেষ মাখামাখিও তিনি পছন্দ করতেন না। গল্পের আখ্যানে তাঁর বিশেষ ভূমিকা না থাকলেও নীলরতনের স্বভাববৈশিষ্ট্য তথা সাহেবদের সঙ্গে বিরূপ মনোভাব তৎকালীন আইন ব্যবসায়ীদের চারিত্রিক দিকনির্দেশক। তৎকালীন বাংলাদেশে আইন ব্যবসায়ীরা বিশেষ করে উকিলরা স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। ফলে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বা তাদের অনুগত না থাকার মানসিকতা নীলরতন চরিত্রে অনেকাংশেই পরিস্ফুট হয়েছে।

'উদ্ধার' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পরেশ ওকালতি করতেন। এই ওকালতির ফলেই সে তাঁর দরিদ্র অবস্থার নিরসন করেন। ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত বিত্তের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনে সঞ্চিত সন্দেহও (নিজের স্ত্রী গৌরী সম্বন্ধে) বাড়তে থাকে। তার ফলস্বরূপ শহরময় রটনা এবং শেষে গৌরীর মৃত্যু ঘটনা প্রবাহকে বিষাক্ত করে তুলেছে। গল্পের আখ্যানে তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কারণ পরেশ এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনিধারা বিবর্তিত হয়েছে। ওকালতি করে প্রচুর বিত্তশালী হয়েছেন পরেশ। তৎকালীন সময়ে ওকালতি ছিল এমন একটি জীবিকা যার মাধ্যমে আভিজাত্য ও অর্থ অর্জন করা ছিল শিক্ষিত বাঙালিদের কাম্য । এই আভিজাত্য ও অর্থ কীভাবে অনর্থের মূল হিসেবে কাজ করেছে তা পরেশ চরিত্রের মাধ্যমে 'উদ্ধার' গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে।

'একরাত্রি' গল্পের নায়িকা সুরবালার স্বামী রামলোচন রায় নোয়াখলির এক ছোট্ট শহরের সরকারি উকিল। তাঁর মনে কোনো অসন্তোষ ছিল না, দিব্যি পাঁচ টাকা রোজগার করতেন। তামাক টানতে টানতে দেশের দুর্দশা সম্বন্ধেও বক্তৃতা করতে পারতেন। অথচ দেশ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। গল্পের আখ্যানে উকিল রামলোচন রায়ের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি যেমন নেই তেমনি গল্পের আখ্যানে তাঁর বিশেষ গুরুত্ব নেই। তবে রামলোচনকে অনেকটা মোসাহেবী চরিত্র বলা যায়। কারণ দেশের দুরবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেও প্রকৃত পক্ষে সেই বিষয়ে তিনি বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। ওকালতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন এবং তার ফলে নিরবচ্ছিন্ন জীবন প্রক্রিয়াই এই মোসাহেবিয়ানার ইন্ধন হিসেবে কাজ করেছে।

'চিত্রকর' গল্পে চুনিলালের বাবা মুকুন্দ ওকালতির কাজে প্রবীণ । কিন্তু ঘরের কাজে তার বিষয়বুদ্ধির অভাব ছিল। পয়সা তার কাজের মধ্য দিয়ে যথেষ্ট বইত। জীবনযাত্রার অভ্যাস ছিল সাধাসিধে এবং মনটা ছিল মুক্ত প্রকৃতির। স্ত্রী সত্যবতীর প্রতি ছিল তাঁর অমায়িক ভালবাসা। মাঝে মাঝে আদালত থেকে ফেরার পথে কিছু রঙ, কিছু রঙিন রেশম, রঙের পেন্সিল কিনে এনে স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে তাঁর শোবার ঘরে সাজিয়ে রাখতেন। কোনোদিন বা তার আঁকা ছবির প্রশংসাও করতেন। একদিন একটা মানুষের ছবিকে উলটিয়ে ধরে - বকের ছবি খুব সুন্দর হয়েছে বলে মন্তব্য করলেন। গল্পের আখ্যানে তাঁর গুরুত্ব উল্লেখ্য। তাঁর আচার-আচরণে একটা বিলাসী মনোভাব ফুটে ওঠে। যা তৎকালীন ওকালতি ব্যাবসায়ে প্রতিষ্ঠিত সকলের মতোই গতানুগতিক।

অন্যদিকে রামতারণ 'সমস্যাপূরণ' গল্পের জনৈক উকিল। জমিদার কৃষ্ণগোপালের অর্থে লেখাপড়া শিখে রামতারণ মানুষ। বৃদ্ধ বয়সে কৃষ্ণগোপাল তীর্থ থেকে ছুটে এসে তার ছেলের সঙ্গে এক বিধবার সন্তানের বিষয়-বিরোধের নিষ্পত্তি করলেন। ফলে সূক্ষ্ম-বুদ্ধি উকিলের তথা রামতারণের কৃষ্ণগোপালের চরিত্রের প্রতি সন্দেহ হয়। এতদিনে সে বুঝতে পারলে – 'ভালো করে অনুসন্ধান করলে সব সাধুই ধরা পড়ে- যিনি যত মালা জপুন, পৃথিবীতে আমার মতোই সব বেটা।' (সমস্যাপূরণ, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, পৃঃ ১৮১) কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত দায়ধর্ম-মহত্ব সমস্তই যে কাপট্য- এই স্থির করে তার এতদিনকার একটা দুর্বোধ্য সমস্যা পূরণ হল। সূক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন উকিল রামতারণ নিজের পালনকর্তাকে সন্দেহ করেছে। তার চরিত্রের একটি বিশেষ দিক সন্দেহ-প্রবণতা। যা তার জীবিকার সাথে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

'রবিবার' গল্পে অম্বিকাচরণ একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। বিষয়-ব্যাপারে ও ওকালতি-ব্যাবসায়ে অম্বিকাচরণ পাকা। পূজা-অর্চনার পাশাপাশি আইনের পরামর্শ দেওয়া দুই ব্যাপারেই তিনি সমভাবে তাল মিলিয়ে চলেন। অভীকের নাস্তিকতা ব্যাপারে তিনি উদাসীন। আখ্যানে অম্বিকাচরণের গুরুত্ব কম নয়। 'নামঞ্জুর গল্প'

গল্পের বক্তার বাবা বাংলাদেশের কোনো এক মহকুমার সরকারি উকিল এবং রায়বাহাদুর। বঙ্গভঙ্গে তাঁর ছেলে বিদ্রোহীর ভূমিকা নিলে ঘটা করেই তিনি তাঁর বাড়ি আসা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর জানা গেল উইলে তাকে বিষয়-বঞ্চিত করেনি। গল্পের আখ্যানে তার ভূমিকা কম নয়।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের অন্যতম চরিত্র শশীভূষণ সদ্য বিকশিত এম.এ, বি.এল। লোকের সঙ্গে মেলামেশা কি সভাস্থলে দুটো কথা বলা তার দ্বারা হয়ে উঠত না। চোখে কম দেখত বলে তার ভ্রূ-কুঞ্চিত দৃষ্টি লোকের কাছে ঔদ্ধত্য বলে মনে হতো। পরীক্ষা পাশের পরেও কোনো কাজে ভিড়তে অক্ষমতার জন্য পিতার ইচ্ছায় সে বিষয়-রক্ষার কাজে নিযুক্ত হল। কিন্তু পল্লীবাসীদের উপদ্রপে শশিভূষণ ক্রমেই তার বিবরের মধ্যে অদৃশ্য হতে লাগল। ঘরের একটি কোণে তক্তপোষের উপরে কতগুলি বাঁধানো বই; আর নতপৃষ্টে সে সবসময় পাঠ-নিবিষ্ট থাকে। বিষয় কী করে রক্ষা হত তা বিষয়ই জানে।

সদ্য পাশ করা উকিল শশিভূষণ প্রফেশনাল আইনজ্ঞ নয়। সেইজন্য মিথ্যা মকদ্দমায় বিরুপতা প্রকাশ করে সে প্রতিবেশী হরকুমারের বিষদৃষ্টিতে পরে। তার খেতের মধ্যে গরু প্রবেশ করে, সীমানা নিয়ে বিরোধ বাধে, প্রজারা সহজে খাজনা দেয় না এবং উলটে মিথ্যা মকদ্দমার, এমনকি সন্ধ্যার পরে প্রহারের ভয়ও দেখায়। শান্তিপ্রিয় শশিভূষণ শেষে গ্রাম ছেড়ে কলকাতা যাবার উদ্যোগ করে। ইতিমধ্যে মফঃস্বল ভ্রমণে আগত জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট কতৃক হরকুমার অন্যায়ভাবে অপমানিত হলে হরকুমার তার সাথে দেখা করতে গিয়ে বলে, 'সাহারের নামে মানহানির মকদ্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকিল হইয়া লড়িব।' (মেঘ ও রৌদ্র, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, পৃঃ ১৯৬) তারপর মকদ্দমার দিন ম্যাজিস্ট্রেট তাকে খাস কামরায় ডেকে গোপনে মিটমাটের প্রস্তাব করায় সে 'আমার মক্কেলকে আমি এরূপ পরামর্শ দিতে পারি না। তিনি প্রকাশ্যভাবে অপমানিত হইয়াছেন, গোপনে ইহার মিটমাট হইবে কী করিয়া।' (মেঘ ও রৌদ্র, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, পৃঃ ১৯৭) – এই বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে ফিরিয়ে দেন। তাছাড়া পরবর্তী সময় কলকাতা চলে যাওয়ার সময় নদীবক্ষে কোনো এক সাহেবের বন্দুকের গুলিতে মহাজনের নৌকার সলিল সমাধি প্রত্যক্ষ করেও শশিভূষণ প্রতিবাদ মুখর হয়েছে। সাহেবদের প্রতি শশিভূষণের এই বিদ্রোহী মনোভাব তৎকালীন আইন ব্যবসায়ীদের ধাতের বিষয় ছিল।

শুধুমাত্র উকিল জীবিকার অধিকারী চরিত্রই নয়, বৃত্তিভিত্তিক মধ্যবিত্ত আইনজীবী শ্রেণির নানা জীবিকার অধিকারী চরিত্রও রবীন্দ্র ছোটগল্পে পাওয়া যায়। বৃত্তিবিত্তিক মধ্যবিত্ত আইনজীবী শ্রেণির অন্তর্গত ব্যারিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, হাকিম, কালেক্টর, মুন্সেফ, মোক্তার প্রভৃতি বিচিত্র জীবিকার অধিকারী মানুষের উপস্থিতি তাঁর ছোটগল্পে রয়েছে।

'কর্মফল' গল্পের নলিনীর বাবা মিস্টার ভাদুরি একজন ব্যারিস্টার। মিস্টার ভাদুরির কায়দা কানুন সাহেবী। নলিনীর ভাবগতিক মিস্টার ভাদুরি বুঝতেন না। তিনি সাবেকী মানসিকতার লোক। সবকিছু বিচার-বিবেচনা করে চলার সাবেকী মানসিকতা বা প্রবণতার মধ্যে তার জীবিকার প্রভাব আংশিক পরিমাণে বিদ্যমান।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে জনৈক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট চরিত্রে রয়েছে শশিভূষণের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মনে করেন শশিভূষণের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের মূলে রয়েছে কনগ্রেসের চাল। একটা পাক-চক্র বাধিয়ে অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখে গভর্ণমেন্টের সঙ্গে খিটিমিটি বাধাবার জন্যই কনগ্রেসের এই চাল। ক্ষুদ্র কন্টককে একেবারে দমন করে ফেলবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয়নি বলে ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেন্টকে অন্তত দুর্বল বলে সাহেব মনে মনে ধিক্কার দেন। ঔপনিবেশিক মানসিকতায় পুষ্ট ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের এই চরিত্রবৈশিষ্ট্য থেকে তৎকালীন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের একটা চিত্র ভেসে ওঠে।

কিন্তু অন্যদিকে 'দিদি' গল্পের সাহেব ম্যাজিস্টেট স্বহৃদয় মানসিকতা সম্পন একটি চরিত্র। তিনি ঔপনিবেশিক মানসিকতায় ভাবাপন্ন চরিত্র নন। 'দিদি' গল্পে তারিণীবাবু একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। শশীকলার স্বামী জয়গোপাল তারিণী বাবুর পরিচিত ছিলেন। ফলে শশীকলা তাঁর অন্তঃপুরে অভিযোগ করতে এলে প্রথমে তিনি বিরক্ত হলেও শশীকে আশ্বস্ত রেখে তিনি জয়গোপালকে পত্র লিখে দিলেন। তারিণীবাবুর

মত উদার মানসিকতা সম্পন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জীবিকাধারী চরিত্রের পাশাপাশি 'বিচারক' গল্পের মোহিতমোহন দত্তের মত ধূর্ত চরিত্রও বিদ্যমান। সমাজের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত জজ মোহিতমোহন চারিত্রিক দিক দিয়ে ব্যভিচারী হওয়া সত্ত্বেও আপন কুকর্মের জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নন। বরং যে ক্ষীরোদার প্রতি তিনি অনাচার করেছিল তাকেও দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হননি।

'একরাত্রি' গল্পের বক্তার প্রতিবেশী নীলরতন একজন কালেক্টর। বাল্যকালে নীলরতন ঘর থেকে পালিয়ে লেখাপড়া শিখে কালেক্টরের নজির হয়। গল্পের আখ্যানে নীলরতনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। তবে নীলরতন চরিত্রের মাধ্যমে সহজেই অনুমেয় যে, তৎকালীন সময়ে কালেক্টর হওয়ার প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের ঝোঁক বেড়েছিল। আলোচনার সূচনাসূত্রে সেই প্রবণতার কারণ সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বৃত্তিভিত্তিক মধ্যবিত্ত আইনজীবী শ্রেণির সকল চরিত্রই আখ্যানে সমান গুরুত্ব পায়নি। তবে একথা স্পষ্ট যে, ঔপনিবেশিক শাসনের শত বিধিনিষেধের মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত উনিশ ও বিশ শতকে তার যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে রবীন্দ্র ছোটগল্পে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিফলন ঘটে । তৎসঙ্গে বৃত্তিভিত্তিক মধ্যবিত্ত আইনজীবী শ্রেণির অন্তর্গত নানা জীবিকার অধিকারী মানুষের প্রতিবিম্ব রূপেও রবীন্দ্র ছোটগল্প একটা অন্য মাত্রা পেয়ে যায়।

সহায়ক গ্রন্থ:-

গুপ্ত ক্ষেত্র, রবীন্দ্র ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব, পুস্তক বিপণি, প্রকাশকাল -১৯৯৩।
ঘোষ তপোব্রত, রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ, দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল - ২০১২।
গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ, বাক-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রকাশকাল - ১৪১৭।
ঘোষ বিনয়, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, প্রকাশ ভবন, প্রকাশকাল - ২০০৯।
ঘোষ বিনয়, মেট্রোপলিটন মন : মধ্যবিত্ত : বিদ্রোহ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, প্রকাশকাল - ২০০৯।
চৌধুরী সিদ্ধার্থরঞ্জন (সম্পাদনা), বাঙালী মধ্যবিত্ত মানস, উবুদশ, প্রথম প্রকাশ - ২০১১।
মুখোপাধ্যায় সুবোধ কুমার, বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৮।
মণ্ডল স্বপনকুমার, মধ্যবিত্ত বাঙালি এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবী, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ - ২০১০।